International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VIII, Issue-V, September 2022, Page No. 52-58
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v8.i5.2022.52-58

পরিযায়ী দেশ ও অতীতচারী মনন : নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে

শ্যামল কুমার মণ্ডল
শিক্ষক, গলসী মহাবিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ, গলসী, পূর্ব বর্ধমান

Abstract:
Hundreds of pain and sufferings are hidden in the very word PARTITION. Many poets and writers have pointed that pain in their writings. Many people have been uprooted by Communal disharmony. Some are ousted from home and some are evicted fromideals. "Nilkantha Pakhir Khnoje" by Atin Bandhopadhyay is the story of these displaced and deviant men. Atin Babu in this novel has shown the cries and sufferings of people without country and homeland. Along with that the writer introduced the reader to the socio-political turmoil of the then Bangladesh. The emotions of his own country and homeland are depicted in the novel with great tenderness or with great intensity. When religion emerges bigger than life and ugly politicians use it as a tool, People witness its aftermath in the Communal riots before independence and partition. As if we are becoming more and more Hindus and Muslims. We are failing to emerge as proper human beings. The result of which is the Partition of the country and the continuous bleeding of the hearts of the destitute. We try to find the answer in the discussion by keeping the novel "Nilkantha Pakhir Khnoje" by Atin Banerjee in the front.

Key Words - Partition, Communal riots, Destitute, Deviant, political unrest, religious sentiments.

অবিভক্ত বাংলাদেশ। লেখক যে সময়ের কথা উপন্যাসের শুরুতে ব্যক্ত করছেন বাংলাদেশের রাজনৈতিক তাপ উত্তাপ ততটা ছিল না। ধীরে ধীরে কাহিনী যত এগিয়ে গেছে ততই প্রকাশিত হয়েছে রাজনৈতিক পালাবদলের চিত্র। সাথে সাথে বাংলাদেশের অপরূপ প্রকৃতি যেন লেখকের বর্ণনায় হয়ে উঠেছে জীবন্ত। আর প্রকৃতির কোলে বড় হয়ে ওঠা চরিত্রগুলি অনবদ্য হয়ে পাঠক মনের শুশ্রূষা করেছে। সরল সাধাসিধে গ্রাম্যমানুষ যা কোনোদিন ভাবতে পারেনি, তাই হয়েছে। ধর্মীয় হিংসা, বিদ্বেষ, খুনোখুনি, রক্ততে ভেসে গেছে সোনার বাংলাদেশ। অথচ অর্জুন গাছের ডালে বসা নীলকণ্ঠ পাখি সাক্ষী আছে উৎসবে, আনন্দে, আলো ঝলমল পরিবেশে নিতান্ত সরল মানুষেরা ধর্মীয় গণ্ডী অতিক্রম করে একদিন এই 'ভাটির দেশ' বাংলাদেশে মেতে উঠত। পাগল জ্যাঠামশায়, সোনা, ঈশম শেখ, ফেলু, রঞ্জিত, মালতী, সামসুদ্দি, ফতিমা প্রমুখ চরিত্রগুলির দ্বন্দ্ব-বেদনার সাথে পাঠক কখন যে একাত্ম হয়ে যায় তা পাঠক জানতেই পারে না। বিভিন্ন

চরিত্রের কলরবে উপন্যাসের কাহিনী যতো এগোয় সারাদেশের মতো গ্রামে-গ্রামে সবার মনে বাড়তে থাকে দ্বিধাদ্বন্দ্বের চারাগাছ। ধর্ম বিপন্ন-সেই ইস্তেহার নিয়ে ধীরে ধীরে গাঁথা হতে থাকে মানুষে মানুষে বিভেদের দেয়াল, বাড়ে সামসুদ্দিনের মতো মানুষের মনে বিদ্বেষ। তারপর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার চূড়ান্ত পর্যায়ে একদিন এখানেও আসে দেশভাগের খবর। সারাদেশের মানুষের ঘরবাড়ি আর আবেগমথিত মাটির ওপর দিয়ে রাডক্লিফ লাইন বিভাজনের সীমান্তরেখা টেনে দেয়। ধর্মীয় সহিংসতা, সীমান্ত পারাপারে মারা যায় লাখো মানুষ। বাস্তুচ্যুতও হয় অসংখ্য মানুষ। দেশভাগ ও নিয়ত রক্তক্ষরণের অনবদ্য ঐতিহাসিক দলিল হয়ে উঠেছে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসটি।

দেশভাগ অনেকের কাছে যেমন অত্যন্ত আগ্রহের বিষয় তেমনি স্পর্শকাতরও বটে, কেননা একসময় যে দেশে একটি মানুষের জন্ম থেকে বড় হওয়া পর্যন্ত বাল্য কৈশোরের লীলাভূমি ছিল, তাঁকে যখন রাজনৈতিক পালাবদলের নিষ্ঠুর ধর্মীয় অভিঘাত সহ্য করতে হয় তখন তাঁর মধ্যে শুরু হয় ভয়ানক যন্ত্রণা এবং হৃদয়ের অনন্ত রক্তক্ষরণ। এই অনুভব একান্ত তাঁদেরই যাঁদেরকে দেশত্যাগ করতে হয়েছে একপ্রকার বাধ্য হয়েই। বহু মানুষ এই যন্ত্রণার সাক্ষী থেকেছে। এই উপন্যাস দেশভাগের সেই যন্ত্রণারই ইতিহাস। রাজনৈতিক ঘটনার পাশাপাশি উপন্যাসে প্রকৃতি চিত্র, চরিত্র বর্ণনাতেও লেখক সফল হয়েছেন। উপন্যাসটি শুরু হচ্ছে হেমন্তের বিকালের পটভূমিকায়। উপন্যাসের প্রকৃতি ও চরিত্র যেন একে অপরের সাথে পরিপূরক হয়ে গেছে, ফলে পাঠকের অনুভূতির অতলে খুব সহজেই এই কাহিনী প্রবেশ করে গেছে।

প্রায় চারশ পৃষ্ঠার এই উপন্যাসের অনেক অংশ জুড়ে রয়েছে দেশ আর মাটির অপূর্ব বর্ণনা ও বন্দনা। সোনা এই উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। তার জন্মের মধ্য দিয়েই কাহিনীর সূত্রপাত। নীলকণ্ঠ পাখির কথাও এই উপন্যাসে ঘুরে ফিরে এসেছে পাঠকের মনে বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে। নীলকণ্ঠ এমন এক পাখি যে পাখি মানুষকে সারাজীবন ঘুরিয়ে মারে। এই পাখি যেন মানুষের 'কামনা-বাসনার ঘর'। প্রতিটি মানুষের মনেই স্বপ্ন থাকে, একদিন সেই পাখি উড়ে আসবে- কিন্তু পাখি আর ফিরে আসে না। তবু মানুষ স্বপ্নকে অনেক আশা নিয়ে বুকের মধ্যে লালন পালন করে। মণীন্দ্রনাথ অর্থাৎ পাগলঠাকুর সেই নীলকণ্ঠ পাখিকে খুঁজে চলেন নিরন্তর। হঠাৎ হঠাৎ তিনি দুহাত উপরে তুলে তালি বাজাতে থাকেন – যেন আকাশের কোন প্রান্তে তাঁর পোষা হাজার হাজার নীলকণ্ঠ পাখি হারিয়ে গেছে। তাই তিনি হাতের তালি দিয়ে তাদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন। মণীন্দ্রনাথের বড় ইচ্ছা, - "জীবনের হারানো সব নীলকণ্ঠ পাখিরা ফিরে এসে রাতের নির্জনতায় মিশে থাক।" কিন্তু নীলকণ্ঠ পাখি আর নামে না। পাঠকেরাও সোনার পাগল জ্যাঠামশাই এর মতো নীলকণ্ঠ পাখি খুঁজেছে। বড়কর্তা ওরফে মণীন্দ্রনাথ উত্তর চল্লিশের মানুষ, ঋজু শরীর তার- " ... আর ধনকর্তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবকিছু নতুন করে লক্ষ্য করলেন- বড়দার বড় বড় চোখ, লম্বা নাক, প্রশস্থ কপালের পাশে বড় আঁচিল সবচেয়ে সেই সূর্যের মত আশ্চর্য রঙ শরীরের এবং সাড়ে ছয় ফুটের উপর শরীরের ঋজুতা। দেখলে মনে হবে মধ্যযুগীয় কোন নাইট রাতের অন্ধকারে পাপ অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছেন! ..."[১] এই মেধাবী মানুষটিকে একদিন দরগার হাসান পীর বলেছিলেন, "পীর পয়গম্বর হইতে হইলে তর মত চক্ষু লাগে। তর মত চক্ষু না থাকলে পাগল হওন যায় না, পাগল করন যায় না।"[২] সেই মণীন্দ্রনাথ সত্যিই পাগল হয়েছিল। মানসিকভাবে অসুস্থ মণীন্দ্রনাথ যখন উচ্চারণ করে 'গ্যাৎচোরেৎশালা' তখন চমকে উঠতে হয়। যতটি দৃশ্যপটে মণীন্দ্রনাথ উপস্থিত হয় এই একটি শব্দে অবলীলায় তিনি যেন তার মনের ইচ্ছাটা বা মনের না বলা কথাটা বলে ফেলেন।

আপন দেশের মাটির লাবণ্য গাছের ডালে-ডালে, ছায়ায়-ছায়ায়, পুকুরের পাড়ে-পাড়ে জীবনের যে বন্দনা তা পাঠকের কাছে অসাধারণ অভিজ্ঞান। সামসুদ্দিনের মায়ের বাতের ব্যাথার জন্য শশীবালা 'ঠাইরেন' এর উদ্বেগ এবং শশীবালা কতৃক তেলের শিশি প্রদানের দৃশ্যে আমরা খুঁজে পাই ধর্মে-বর্ণে মিথস্ক্রিয়া; দুদিন ধরে পেটে ভাত না জোটা জোটন বিবির নরম মাটিতে কচ্ছপের ডিম খোঁজা, আলাকুশী লতার কাঁটার ঝোপ পেরিয়ে পানের পাতা ছেঁড়া, ফকির সাহেবের সামনে সানকির নুন মেশানো ফ্যানগলা ভাত – এসব দৃশ্যপট কি বানিয়ে লেখা যায়? পাঠককে কি ভাসানো যায় কাল্পনিক বেদনায়? যায় না। এই উপন্যাস পড়তে পড়তে বেদনার চোরাস্রোতে ভাসতে ভাসতে বইয়ের এক একটি চরিত্র ইশম, জোটন, জালালি, মালতী, ফতিমা, সোনা, ফেলু এদের সাথে যেন পাঠক প্রিয় জন্মভূমিতে বিচরণ করেছে। মণীন্দ্রনাথ যখন আকাশ আর দরগার ভাঙা কাঁচের স্বচ্ছভাব মথিত করে হেসে উঠে সোনাকে বলেন, - "নক্ষত্র দ্যাখো-ঘাস-ফড়িং-ফুল-পাখি দ্যাখো, জন্মভূমি দ্যাখো।" সেইসময় অসম্ভব সুন্দর ভালোবাসায় আমরা সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা বাংলাদেশকেই প্রত্যক্ষ করি। উপন্যাসের আর একটি অংশ উল্লেখ না করলেই নয়, - "এই যখন দৈনন্দিন সংসারের হিসাব, তখন বৃন্দাবনী দুই মেয়েকে বাংলাদেশের মাটির কথা শোনায়। শরৎকালে শেফালি ফুল ফোটে, স্থলপদ্ম গাছ শিশিরে ভিজে যায়, আকাশ নির্মল থাকে, রোদে সোনালী রং ধরে – এই এক দেশ, নাম তার বাংলাদেশ, এদেশের মেয়ে তুমি। এমন দেশে যখন সকালে সোনালী রোদ মাঠে, যখন আকাশে গগনভেরি পাখি উড়তে থাকে, মাঠে মাঠে ধান, নদী থেকে জল নেমে যাচ্ছে, দু'পাড়ে চর জেগে উঠেছে, বাবলা অথবা পিটকিলা গাছে ছেঁড়া ঘুড়ি এবং নদীতে নৌকা, তালের অথবা আনারসের, তখনই বুঝবে শরৎকাল এ-দেশে এসে গেল।" শরৎকালকে চিত্রিত করার অসাধারণ প্রয়াস পাঠককে প্রকৃতির অপূর্ব অনুভূতিতে মথিত করে তোলে।

প্রকৃতির ন্যায় এই উপন্যাসের চরিত্রগুলিও নিতান্ত সহজ সরল। যেমন ঈশম শেখ চরিত্রটি সকলের মন জয় করে নেয়। উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ অবধি তার ভূমিকাকে লেখক খুব দরদ দিয়েই ফুটিয়ে তুলেছেন। ঠাকুরবাড়ির বিশ্বস্ত বান্দা ঈশম শেখ প্রথমে গয়না নৌকার মাঝি ছিল। শরীর ছিল প্রচণ্ড শক্তসামর্থ্য, কিন্তু বয়স বাড়ায় সে আর নৌকা চালাতে পারে না, নদীর চরে সে তরমুজের ক্ষেত পাহারা দেয়। লণ্ঠনের আলোতে বিল ভেঙে, গ্রাম ডিঙিয়ে সে মুড়াপাড়ায় ধনকর্তা ওরফে চন্দ্রনাথের পুত্রসন্তান হয়েছে এই খবর নিয়ে যাচ্ছে। পথের মধ্যে এই সাহসী মানুষটিকে কানাওয়ালায় ধরেছে- এই ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। উপন্যাসের এই দৃশ্যপটসহ ফাওসার বিল, গজার মাছের আক্রমণ, গর্ভবতী বোয়াল, তরমুজ ক্ষেতের সাদা জ্যোৎস্নায় পৃথিবীর আদি মানব-মানবীর মতো সুন্দর নর-নারীর ভেসে যাওয়া, সূর্যমুখী ঘা সারাবার বাসনায় ফেলুর জোনাকি ধরা ইত্যাদি দৃশ্যপট পড়তে পড়তে মনে হয় যে কাহিনী রচনায় লেখকের গভীর মমতা ও অন্তর্দৃষ্টি কতটা ব্যাপক ছিল।

রাজনৈতিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি মানুষের জীবনে কতখানি পরিবর্তন আনতে পারে তা উপন্যাসের বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে লেখক বর্ণনা করেছেন। রাজনৈতিক চেতনা সমগ্র উপন্যাসটিকে অন্য মাত্রা দিয়েছে। দাঙ্গা, দেশভাগ, ছিন্নমূল মানুষের কথা তো আছেই, পাশাপাশি বাংলাভাষার জন্য সংগ্রামের রক্তাক্ত ইতিহাসকে লেখক এই উপন্যাসে মর্মস্পর্শী করে তুলেছেন। একটি মেলাকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার ভয়াবহতায় শিউরে উঠতে হয়। সামুর যোগ্য সঙ্গী জব্বর এই মেলাতে ইস্তাহার বিলি করতে এসেছে। সবকিছুই ঠিকঠাক চলছিল কিন্তু স্নানের ঘাটে আনোয়ার নামে এক মুসলিম মাতব্বর গোছের লোক হিন্দু রমণীর শ্লীলতাহানি করে। এই ঘটনায় আনোয়ারকে ধরে বেদম প্রহার করে কাছারি বাড়িতে

নিয়ে এলে সেখানে উপস্থিত হয় হিন্দু মুসলিম উভয়পক্ষের লোকজন। নানা তর্কবিতর্কের পরও ফয়সালা না হওয়ায় জোর করে আনোয়ারকে ছিনিয়ে নিতে গেলে বন্দুকের গুলিতে দুই মুসলমান ব্যক্তি নিহত হয়। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় বীভৎস পৈশাচিক হত্যালীলা। মেলার দোকানপাট, সার্কাসের তাঁবু নিমেষের মধ্যে তছনছ হয়ে যায়। চারিদিকে বন্দুকের আওয়াজ, মশালের আগুনে ছারখার হয়ে উৎসবের আনন্দ। বারুদের গন্ধ আর মেলার জিলিপির গন্ধ মিলেমিশে যেন একাকার। এই মেলাতেই দেখা গেল হিন্দু-মুসলিম পরিষ্কার দুই দলে ভাগ হয়ে গেছে। নদীর দুই পাড়ে দুই দল একে অপরের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত। হিন্দু এবং মুসলমানের যে দুই দেশ হতে চলেছে তার আভাস এই মেলার দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে টের পাওয়া গেল। পরবর্তী পরিস্থিতি যে ক্রমশ জটিল হয়ে উঠবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

আবেদালির বড় ছেলে জব্বর শুধুমাত্র পয়সার লোভে বিধবা হিন্দু যুবতি মালতীকে রাতের অন্ধকারে করিম শেখের নৌকায় তুলে নিয়ে গেছে। আবেদালির মানসম্মান সব ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে- এই নিয়ে আবেদালির মনে ক্ষোভের অন্ত নেই। শুধু আবেদালির নয় গোটা পাড়ার নাম ডুবিয়েছে জব্বর। এখান থেকেই বোঝা যায় হিন্দু মুসলমান যেখানে আগে পাশাপাশি সহবস্থান ছিল সেখানে সেই পূর্বের সম্পর্কে ভয়ানক ফাটল ধরেছে। জোটন এবং ফকিরসাহেবের বা বলা ভালো মুশকিল আসানের লম্ফের জাদুতে মালতী ফিরে আসে পাশবিক অত্যাচারে বিধ্বস্ত হয়ে নরেন দাসের ঠিকানায়। সেবা শুশ্রূষার দ্বারা মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনে জোটন-ফকিরসাহেব। মানবিকতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ তারা। স্বদেশী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ রঞ্জিত আরও একজন বড় মাপের মানুষ। দেশ অন্তপ্রাণ এই মানুষটিও পাঠকের মনের মণিকোঠায় গাঁথা হয়ে থাকবে। বিপ্লবী রঞ্জিত শেষপর্যন্ত মালতীর দায়িত্ব নেয় কিন্তু দেশমাতার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে এবং মালতীকে জোটনের কাছে রেখে আসে। 'বন্দেমাতরম্' উচ্চারণ করতে করতে মিলিয়ে যায় গভীর অরণ্যে। এখানেই উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের সমাপ্তি।

দ্বিতীয় খণ্ডে দেখা যায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত পটপরিবর্তন। চারিদিকে শুধু অচেনা পরিবেশ, অজানা আশঙ্কা প্রতিটি চরিত্রকে ঘিরে ধরেছে। চেনা মানুষ কেমন যেন অচেনা হয়ে উঠছে - "... এভাবে জানালায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে একদিন বড়বৌ দেখল মাঠের ওপাশে কিছু মশাল জ্বলে উঠছে। একটা দুটো করে অনেক ক'টা মশাল। মশালগুলি নদীর পাড়ে অদৃশ্য হতে থাকল। ওরা ধ্বনি দিচ্ছিল, আল্লা-হু-আকবর।" ভয়ানক উত্তাল সময়ের সাক্ষী এই উপন্যাস। অনেক জায়গাতেই রয়েছে রাজনৈতিক হিংসা বা দেশভাগের অমানুষিক চিত্র – "তখন সকলে যে যার মতো ঘর ছেড়ে পালাচ্ছে। ঝোপে জঙ্গলে আশ্রয় নিচ্ছে। ওরা এসব হিন্দু গ্রামে আগুন দেবে বলে উঠে আসতে পারে। বড় বৌ এবং ছোট শিশুরা, ধনবৌ, গ্রামের নারী এবং শিশুরা যে যার মতো ঝোপে জঙ্গলে আশ্রয় নিত। ... আর হিন্দু যুবকেরা একসঙ্গে দাঁড়িয়ে গোপাটে ধ্বনি তুলত, বন্দেমাতরম্!" একদিকে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' অন্যদিকে 'ভারত মাতা কি জয়' ধ্বনি বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে ভয়ংকর দুঃসময়ের দিকে ঠেলে দিয়েছিল – "এ দুটো সাল বড় দুঃসময়য়ের ভিতর কাটছে। যে যার মতো সুপারির শলা শানাচ্ছে। যেন দুঃসময়য়ের শেষ নাই। " গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে দেশভাগের ধ্বনি সবার বুকের রক্ত হিম করে দেয়। তবুও এই উপন্যাসে বড়বৌ আশাবাদী যে ঘোর দুর্দিন একসময় কাটবে, সুদিন আসবে, আবার আগের মতো সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে। কিন্তু দুঃসময় উত্তরোত্তর বেড়েই চলে যেন ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো। ফেলুরও মাথার ঠিক নাই, তার বহু দিনের জমানো ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় পাগল ঠাকুরের গলায় কোরবানির চাকু চালিয়ে। তার কথায় – "হাতি তার হাত ভেঙে পার পেয়ে গেল। জলসা ভেঙে দিল। কেউ কিছু বলতে পারল না। ভাঙ্গা-মসজিদে নামাজ

পড়তে কেউ পেল না- সেই এক মানুষ ভূপেন্দ্রনাথ সবাই ভয় পায়। এখন কে তোমারে রক্ষা করে ! বলে পা দিয়ে মুখটা মাড়িয়ে দিল। শক্ত হয়ে গেছে। ঘাড়টা শক্ত। মুখ হাঁ করা। কত অনায়াসে সে পিছন থেকে গলাতে নিমেষে পোঁচ মেরে দিয়েছিল। ঠিক হালার জবাই করা য্যান একটা মুরগি। টেরও পেল না মানুষটা, পিছনে তার দুশমন, চোখের পলকে গলা হ্যাৎ করে দিল।" এই ভাবে ফেলুর হাতে সোনার পাগল জ্যাঠামশায়ের মৃত্যু হল যা কেউ টের পেল না।

অপরদিকে সোনা এবং ফতেমা নিঃশব্দে হত্যা হয়ে যাওয়া পাগল জ্যাঠামশাইকে খুঁজতে বেড়িয়েছে। হাসান পীরের দরগার মাটিতেই তারা খুঁজছিল, কেউ কোথাও সাড়া দিচ্ছে না। সেখানেও তারা শুনল দেশভাগের খবর। একটি লোক বলতে বলতে যাচ্ছে – 'আমরা বাংলাদেশের মানুষ এবার আলাদা হয়ে যাব।' দেশভাগ মানুষের বন্ধুত্ব, প্রেম, আবেগ সবকিছুকেই আলাদা করে দেবে – এই আশঙ্কায় তারা শিউরে ওঠে – "ফতেমা এসব ব্যাপারে সোনার চেয়ে বেশি খবর রাখে। সে অসহায় চোখে সোনার দিকে চেয়ে থাকল। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি।" সোনাও সেই রাতে বাড়ি ফিরে এসে সব শুনেছিল। শশীভূষণ কাগজ পড়ে সবাইকে দেশভাগের খবর শোনায় – "... ভূপেন্দ্রনাথ মুড়াপাড়া থেকে কাগজ নিয়ে এসেছেন – তাতে লেখা, লর্ড মাউন্টব্যাটেনের বেতার বক্তৃতা – আমার আলোচনার মধ্যে প্রথম প্রচেষ্টা ছিল, মন্ত্রী মিশনের ১৯৪৬ সালের ১৬ই মে তারিখের প্রস্তাবটি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণের জন্য রাজনৈতিক নেতাদের বিশেষভাবে অনুরোধ করা। ঐ প্রস্তাবটিকে অধিকাংশ প্রদেশের প্রতিনিধিরাই মেনে নিয়েছেন এবং আমার মনে হয়, ভারতের সমস্ত সম্প্রদায়ের স্বার্থের পক্ষে এর চেয়ে ভালো ব্যবস্থা আর কিছুই হতে পারে না।..." সুতরাং কোনভাবেই 'পার্টিশন'কে রোখা গেল না। পার্টিশন হবেই কেননা বলপ্রয়োগ করে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষকে একটি সরকারের অধীনে রাখা যাবে না। তাই ভারতবর্ষের ঐক্য রক্ষার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। দেশভাগের যন্ত্রণার চিত্র অনেকটাই ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক সোনা-ফতিমার কথোপকথনের মধ্য দিয়ে – "পরদিন ফতিমা নিজেই এসেছিল ঘটি ও বঁড়শি নিয়ে। সোনা ওর সঙ্গে কথা বলতে বলতে অর্জুন গাছটার নীচে চলে গেছে। সে বলল, দেশভাগ হলে আমরা চলে যাব।

- কোনখানে যাইবেন?
- তা জানি না। মাস্টারমশয় কইছে ওদের দেশটা হিন্দুস্থানে পড়বে। বাবা, জ্যাঠামশাই কেউ থাকবেন না।
- কেন থাকবেন না। ফতিমার বুকটা কেঁপে উঠল।
- জ্যাঠামশাই খেতে বসে বলেছেন, এদেশে থাকলে নাকি আমাদের মান-সম্ভ্রম থাকবে না। "[৩]

এরপর সোনা-ফতিমা কেউই কথা বলতে পারেনি। ফতিমা জানে এই পরিচিত পুকুর, শাপলা ফুল, অর্জুন গাছ, ঠাকুরদার চিতার উপর শানবাঁধানো বেদী এবং বর্ষাকালের নদীর জল – এই সমস্ত কিছু সোনার ভীষণ প্রিয়। এছাড়া শীতের মাঠ, তরমুজের ক্ষেত সব- সবকিছু ভালোবাসার সামগ্রী ছেড়ে চলে যেতে হবে সোনাবাবুকে, এই ভেবে ফতিমা কষ্ট পায়। অন্যদিকে সোনা এই দেশভাগের জন্য দায়ী করে ফতিমার বাবা সামসুদ্দিনকে। তাই অভিমান ভ'রে সে বলে – 'আমার কেবল জ্যাঠামশাইর জন্য কষ্ট হবে।' এই অভিমানপূর্ণ কথাই বুঝিয়ে দেয় শুধু জ্যাঠামশাই নয় গোটা বাংলাদেশের জন্যই তার হৃদয় ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছে। - "...তারপরই দেশভাগের ছবি চারপাশের ছবি চারপাশে ফুটে উঠতে লাগল – বর্ষাকাল এসে গেল। চারপাশে সব বড় বড় নৌকায় লাল নীল রঙের পতাকা, কত রঙ বেরঙের চাঁদমালা, কাগজের

ফুল, নতুন লুঙ্গি পরে, নতুন জামা গায়ে মাথায় ফেজ টুপি পরে ছেলেরা, মেয়েরা নাকে নোলক পরে, নদীর চরে নৌকা ভাসিয়ে সরাসরি চলে গেল – ওরা চলে গেল...।" নিজের জন্মভূমিকে ছেড়ে চলে যাওয়ার বেদনায় ঋদ্ধ হয়েছে উপন্যাসের এই অংশটি। চারিদিকে শুধু যেন বিসর্জনের আবহাওয়া। বাড়ি, জমি-জায়গা, এমনকি ভালোবাসাকে বিসর্জন দিয়ে অন্য দেশে, অন্য জায়গায়, অন্য কোনখানে নিরুদ্দেশ যাত্রা। অচেনা, অজানা পরিবেশ অন্যদিকে সবকিছু ছেড়ে চলে যাবার নিদারুণ কষ্ট সোনা-র মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। উপন্যাসের শেষ অংশে ভাঙ্গা-গড়ার খেলা প্রত্যক্ষ করা যায় – "সোনা দেখল এক সকালে কিছু মানুষজন এসে ঘরগুলির ওপর উঠে টিনের স্ক্রু খুলে দিচ্ছে। আর টিনগুলো রাখছে আলাদা করে। ওর বার বার মনে হয়েছে জ্যাঠামশাই শেষ পর্যন্ত মত পাল্টাবে। কিন্তু যখন দেখল টিনগুলি খুলে নেওয়া হচ্ছে তখন সে নিজেও কেমন একা একা ঘুরে বেড়াতে লাগল বাড়িটার চারপাশে।" রাজনীতি বা ধর্মের কাছে সোনার আবেগের বা ভালোবাসার কোন মূল্য নাই। ধর্মের স্বার্থে, রাজনীতির স্বার্থে তাই সোনাকে নিজ দেশ ছেড়ে পরবাসে যেতেই হবে – এই নির্মম বাস্তবকে সঙ্গে নিয়েই পৌঁছেছে কলকাতায়। তবে যাবার আগে অর্জুন গাছের কাণ্ডে খোদাই করে দিয়ে গেছে এক অমোঘ লাইন যা প্রত্যেক পাঠকের মনে দাগ কাটে – "জ্যাঠামশাই, আমরা হিন্দুস্থান চলিয়া গিয়াছি।" এই বাক্যটিকে দেশভাগের সবচেয়ে নির্মম শিলালিপি বলে আমাদের মনে হয়েছে।

পাদটীকা :

১) 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে', অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশনি, পৃঃ – ১৫

২) তদেব, পৃঃ – ৪৮

৩) তদেব, পৃঃ – ৩৬১

তথ্যসূত্র:

১) আইয়ুব, গৌরী - হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক – রবীন্দ্রনাথের চোখে (প্রবন্ধ), চতুরঙ্গ, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৮৮

২) আজিজ, প্রফেসর আব্দুল – স্মৃতি-বিস্মৃতির প্রজন্ম, বইপত্র, সিলেট, বাংলাদেশ, ১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩।

৩) আনিসুজ্জামান – মুসলিম মানস ও বাংলাসাহিত্য (১৭৫৭ – ১৯১৮) প্যাপিরাস, আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা, প্রথম প্যাপিরাস সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০০১।

৪) ইলিয়াস, আখতারুজ্জামান – সংস্কৃতির ভাঙা সেতু, মাওলা ব্রাদার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ – ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮।

৫) খান, ড. লায়েক আলি – বাংলাসাহিত্যে মুসলমান সমাজ ও চরিত্র, সাহিত্যলোক, কলকাতা – ৬, প্রথম প্রকাশ – ১লা বৈশাখ ১৪০৭, ১৪ই এপ্রিল ২০০০।

৬) ঘোষ, নিত্যপ্রিয় – হিন্দু – মুসলমান সম্পর্ক (রবীন্দ্র রচনার সংগ্রহ), মৃত্তিকা, কলিকাতা, জানুয়ারি ২০০৩।

৭) ঘোষ, বিনয়ভূষণ – দ্বিজাতিতত্ত্ব ও বাঙালী, রিফ্লেক্ট, কলকাতা, ১৯৭৯।

৮) ঘোষ, সেমন্তী (সম্পাদিত) – দেশভাগ/ স্মৃতি আর স্তব্ধতা, গাঙচিল, কলকাতা, ২০০৮।

৯) ঘোষ, সুনীতিকুমার – বাংলা বিভাজনের অর্থনীতি-রাজনীতি, নিউ হরাইজন বুক ট্রাস্ট, কলকাতা, ২০০১।

১০) ঘোষদস্তিদার, গৌতম – ভেদাভেদের কথাসাহিত্য, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৪ ।

১১) দাশ উদয়চাঁদ ও চট্টোপাধ্যায় অরিন্দম (সম্পাদিত) – দেশবিভাগ ও বাংলা উপন্যাস, বাংলা বিভাগ, উচ্চতর বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, প্রথম প্রকাশ – ১৫ই আগস্ট, ২০০৫ ।

পত্রিকা – সাময়িকী:

১) আরম্ভ – ১৯ শে মে, ১৪১২ বঙ্গাব্দ, কলকাতা ।

২) উলুখাগড়া – বর্ষা ১৪১৫, আগস্ট ২০০৮, সংখ্যা ১০, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ।

৩) এবং এইসময় – একবিংশ বর্ষ, ৭৩ তম শীত সংখ্যা ১৪১২, কলকাতা।

৪) কোরক – শারদ, ১৪১৫, বাগুইআটি, কলকাতা।

৫) দেশ – বিভিন্ন সংখ্যা, কলকাতা।